আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ১৯৯২

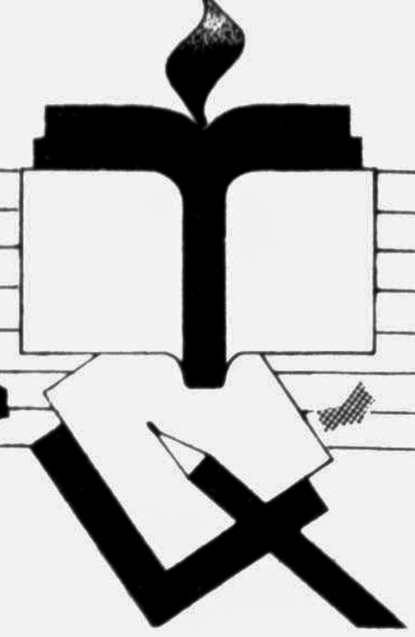

সবার জন্য শিক্ষা

শিক্ষামন্ত্রণালয়
এবং
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের
যৌথ উদ্যোগে

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ৮ই সেপ্টেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস পালিত হচ্ছে। আমি জেনে খুশী হয়েছি যে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে সারা দেশে এই দিনের তাৎপর্য তুলে ধরে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করার অঙ্গীকার নিয়ে আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে।

শিক্ষা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। এই অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। স্বাক্ষরতা একটি বিশাল সমস্যা। এই পর্বত প্রমাণ সমস্যার সমাধান করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে গণজাগরণ সৃষ্টি করতে হবে। তাই, আসুন দেশের জনগণকে স্বাক্ষরজ্ঞান দান করে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এই দিনে নতুন করে শপথ নিই।

আমি আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খালেদা জিয়া
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস একটি আন্দোলন। নিরক্ষরতা-মুক্ত একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠনের মর্মবাণী এই দিবসের তাৎপর্যের মধ্যে নিহিত। বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার জন্য সরকার ইতিমধ্যেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এই ব্যাপক অথচ সমস্যাসঙ্কুল কর্মসূচী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করার জন্য সরকার বেসরকারী সংস্থা সমূহের উদ্যোগকেও স্বাগত জানিয়েছে এবং সহযোগিতা প্রদান করছে। দেশ ও জাতি গঠনে সর্বস্তরে ব্যবহারিক শিক্ষার বিস্তার অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সফলতার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন অপরিসীম। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আশা করা যায়, আগামী ২০০০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি নিরক্ষরমুক্ত সমাজ গঠনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।

কাজী রকিব উদ্দীন আহমদ
ভারপ্রাপ্ত সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ

২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা

সবার জন্য শিক্ষা

ডঃ মোঃ ফজলুল করিম চৌধুরী
পরিকল্পনা প্রধান
শিক্ষামন্ত্রণালয়।

শিক্ষা মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুতঃ শিক্ষা একজন ব্যক্তিকে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদান সাপেক্ষে তাকে পূর্ণাঙ্গ মানব সম্পদে উন্নতি করে, যার ফলে, পরবর্তী পর্যায়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তার অংশগ্রহণ সম্ভব হয়। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল, একজন শিক্ষার্থীকে জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে তোলা, তাকে উৎপাদনক্ষম মানব সম্পদে রূপান্তরিত করা এবং উন্নয়নের অব্যাহত বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা। যে শিক্ষা ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সমাজকে সামাজিক পর্যায়ে ভাল-মন্দ জ্ঞান দানে অক্ষম, তাকে শিক্ষা বলা যায় না। যে শিক্ষা ব্যক্তি জীবনে বেকারত্বের গ্লানি ও অভিশাপ বয়ে আনে, যে শিক্ষা আর্থ-সামাজিক বিকাশে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, সে শিক্ষার পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হলেও তাকে "কল্যাণমুখী পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা" বলা যায় না।

২। বর্তমান জগতে শিক্ষা শুধু ব্যক্তির প্রয়োজনে নয়, শিক্ষা দক্ষ জনশক্তি গঠনের ভিত্তিও বটে। প্রকৃত শিক্ষা এক দিকে মানুষের বিবেককে যেমন প্রশিক্ষিত করে তেমনি অন্যদিকে তার বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটায়। বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ ন্যূনতম শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। সুতরাং, দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। কেবলমাত্র শিক্ষিত জনগোষ্ঠীই বিদ্যমান সমস্যাদির মোকাবেলা করে দেশের উন্নতি নিশ্চিত করতে পারে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ পরিবেশ দিতে পারে।

৩। শিক্ষা ছাড়া উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবিকই অর্থহীন। দেশের সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো গড়ে উঠার মাধ্যমে যখন আয়, নিয়োগ ও উৎপাদন বাড়া শুরু করে, তখন উন্নয়ন হচ্ছে বলা যায়। উন্নয়নের সাথে জাতীয় আয়ের একটি সম্পর্ক রয়েছে এবং জাতীয় আয়ের সাথে শিক্ষার সম্পর্কটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অর্থনীতিবীদ বওমেন ও এন্ডারসন ৮৩টি দেশের জন প্রতি আয় এবং তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিমাপ করে দেখিয়েছেন, দেশের জন প্রতি বাৎসরিক আয় ইউ, এস ৩০০ ডলারের উর্ধ্বে হতে হলে শতকরা ৪৯ ভাগ লোককে শিক্ষিত হতে হবে। একইভাবে অর্থনীতিবীদ মার্কস বোগ এর অনুসন্ধান অনুযায়ী জন প্রতি বার্ষিক আয় ইউ, এস ৫০০ ডলার হতে হলে শতকরা ৯০ ভাগ লোককে শিক্ষিত হতে হবে। যুক্তরাজ্যের ১৮৪০ সালের শিল্প বিপ্লব পর্যালোচনা করে এন্ডারসন ও খান পৃথক পৃথকভাবে যে যে হিসাব পেয়েছেন, তাতে দেখা গেছে যে শতকরা ৬৫ থেকে ৭৫ ভাগ শিক্ষিতের সংখ্যা মূলত যুক্তরাজ্যের শিল্প বিপ্লবের মূলে। অর্থনীতিবীদ পিসলীও অভিমত পোষণ করেন যে শতকরা ৫০ ভাগ লোকের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম ধাপ। এ ছাড়া, এস কে সিং তার Models of Production Relations হারবিসন ও মেয়ার্স তাদের Com-postite Index মত Human Resource Development গ্রন্থ দু'টিতে দেখিয়েছেন, জনগণের শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে দেশের ঐ অর্থাৎ জাতীয় আয়ের এক অবিচ্ছেদ্য সদর্থক সম্পর্ক (Posit-ive Crre-`oationship) রয়েছে।

৪। বর্তমানে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে জনমনে এক অভূতপূর্ব আশার সঞ্চার হয়েছে। সরকারও শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে সীমিত সম্পদের মধ্যে শিক্ষা খাতে উন্নয়ন ব্যয় বাড়িয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা জোরদার করা হয়েছে।

শিক্ষার সুযোগ লাভে সমতা বিধান, শিক্ষাকে কার্যকর ও সময়োপযোগী করে তোলা, ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্যে শিক্ষা এবং শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে শহর-পল্লী এবং পুরুষ-মহিলার বৈষম্য কমিয়ে আনার ব্যাপারে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

৫। শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাদপদতা আর দারিদ্র্যের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। আমাদের স্বাধীনতার আগে ঔপনিবেশিক শাসন আমলে তৎকালীন শাসকেরা জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ঘটাতে চায়নি। ঔপনিবেশিক আমলে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল এক শ্রেণীর সহকারী সৃষ্টি করা। পাকিস্তান আমলেও এর বিশেষ কোন মৌল পরিবর্তন হয়নি। অবশ্য স্বাধীন বাংলাদেশ "শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত" হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে কিন্তু শিক্ষাখাতে বরাদ্দ সেই বিবেচনায় মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। ১৯৭২ সালে আমাদের জাতীয় আয়ের মাত্র ১·০ (এক) ভাগ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল। ১৯৭৫ সালে সেই হার বৃদ্ধি দাঁড়ায় ১·১ ভাগ এবং ১৯৯০ সালে ১·৯ ভাগ। এশীয় দেশসমূহে শিক্ষা খাতে বর্তমানে জাতীয় আয়ের গড় ব্যয়ের পরিমাণ শতকরা ৪·৫ ভাগ। ইউনেস্কো কমপক্ষে জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ ভাগ শিক্ষা খাতে ব্যয় করার প্রস্তাব করেছে। যদিও বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে শিক্ষাখাতে পূর্বের তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধি করেছেন, কিন্তু তুলনামূলক বিচারে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় সেই হার যথেষ্ট কম। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল শতকরা ৪·৬৮ ভাগ। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেই হার বৃদ্ধি করে করা হয়েছে শতকরা ৫·৭৩ ভাগ, যার শতকরা ৪৯ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা খাতে ব্যয় করা হবে কিন্তু তুলনামূলক বিচারে আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ ভারতে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের পরিমাণ জাতীয় উন্নয়ন বাজেটের শতকরা ১২ ভাগ, পাকিস্তানে শতকরা ১১ ভাগ মালয়েশিয়ায় শতকরা ১৯ ভাগ। শ্রীলংকায় মাত্র ২ (দুই) কোটি মানুষের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় আছে দশটি, আর বাংলাদেশে প্রায় ১১ (এগার) কোটি মানুষের জন্য আছে নয়টি। সম্প্রতি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং, এমতাবস্থায় শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যথেষ্ট ব্যয় করা হচ্ছে বলে আত্মতুষ্টির কোন অবকাশনেই।

৬। অবশ্য, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে (১৯৯২-৯৩) রাজস্ব বাজেটে শিক্ষাখাতে ১৫৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। একক খাতে এটাই সর্বোচ্চ বরাদ্দ। এই বরাদ্দ সার্বিক রাজস্ব বরাদ্দের প্রায় ১৯ শতাংশ। রাজস্ব খাতে এই বরাদ্দ ছাড়াও উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দের পরিমাণ হচ্ছে ৭৮২ কোটি টাকা। শিক্ষা খাতে উন্নয়ন ব্যয়ের সিংহভাগ ব্যয় হবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও গণশিক্ষায়। এ জন্য ৫৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৭। এ পরিসংখ্যান থেকে অন্ততঃ একটি ইংগিত পাওয়া যায় যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা খাতে সুযোগ সুবিধা আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তবু এটা অনস্বীকার্য যে এ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ সামগ্রিকভাবে জাতীয় আয়ের ২ শতাংশের কম। এ কথা অবশ্য সত্য যে রাতারাতি এ বিনিয়োগ বৃদ্ধি সরকারের পক্ষে কষ্টসাধ্য, তবুও রাষ্ট্রের অন্যান্য চিহ্নিত ও সঞ্চয়যোগ্য অনুন্নয়ন খাতে ব্যয় হ্রাস করে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি শুধু সম্ভবই নয়, যুক্তিসংগতওবটে।

৮। শিক্ষা ক্ষেত্রে চারটি বিষয় অতিব গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হচ্ছে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা উপকরণ। শিক্ষা উন্নয়ন ক্ষেত্রে এই চারটি উপাদানকে এক সংগে বিবেচনা করতে হবে। কেন না একটির সঙ্গে অপরটির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সরকার উল্লিখিত চারটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, একটি স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে কিছু সংস্কার মূলক উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন- যার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০০০ সাল নাগাদ দেশবাসীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

৯। শিক্ষাকে মোট তিন ভাগে বিন্যাস করা হয় এবং তা হচ্ছে, (ক) আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, (খ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং (গ) অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে সুসংগঠিত শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রদানের সুসংগঠিত এবং সুশৃঙ্খল একটি বিকল্প ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়া, যা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সম্পূরক ও পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। আর অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনভর চলতে থাকে। একে অব্যাহত বা অবিরাম শিক্ষাও বলা যেতেপারে।

১০। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রম বাস্তবায়নে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু দুঃখের সংগে বলতে হয় যে দেশের আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সীমিত এবং সমস্যাগ্রস্ত। বর্তমানে ৬-১০ বৎসর বয়সের শিশুর সংখ্যা হচ্ছে ১ কোটি ৫২ লক্ষ। এর মধ্যে ১ কোটি ১৩ লক্ষ শিশু বিদ্যালয়ে যাতায়াত করে। বাকী ৩৮ লক্ষ শিশু বিভিন্ন কারণে স্কুলের আওতার বাইরে রয়ে গেছে। এ ছাড়া, যারা স্কুলে যাতায়াত করে তাদের মাত্র ৩৩ শতাংশ ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদানকার্য সমাপ্ত করে থাকে। বাকী শিশু ৫ম শ্রেণী সমাপ্ত করার পূর্বেই ঝরে পড়ে। পিতামাতার দারিদ্র্যতা, বাড়িতে লেখা পড়ার পরিবেশের অভাব, অর্থনৈতিক কারণে শিশুদের পারিবারিক কাজে ব্যস্ত থাকা, বাড়ী থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব, পাঠ্যক্রম জীবন কেন্দ্রিক না হওয়া, শিক্ষকদের পাঠদান কার্যে অমনোযোগিতা। শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে যোগাযোগর অভাব এবং অপর্যাপ্ত বিদ্যালয় তদারকি ইত্যাদি কারণে স্কুল গৃহ শিক্ষকদের নিকট আকর্ষণীয় হয়ে উঠতেপারেনাই।

১১। প্রচলিত ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে প্রধান কৌশল হচ্ছে ভৌত অবকাঠামো গঠন। এতে বিদেশী দাতা সংস্থা সমূহের আগ্রহ অত্যধিক। কিন্তু নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ও পরিচালনায় জনসাধারণের অনীহা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রথমে শিক্ষার মান বিষয়ক সমস্যাটির দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, প্রাথমিক স্কুলে নির্ধারিত সিলেবাস বা পাঠ্যসূচী যুগোপযোগী নয়- এতে আগত শতাব্দির চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সুস্পষ্ট প্রস্তুতি নেই। তাছাড়া, পাঠ্যসূচী অনুযায়ী যে ভাবে শিক্ষা দান হওয়া দরকার সেটা হচ্ছে না। শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ও অপরিকল্পিত। এর সংগে যুক্ত হয়েছে আর একটি সমস্যা।

সেটি হলো, আনুমানিক ৪৮ হাজার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় ৩৮ হাজার সরকারী বিদ্যালয় এবং প্রায় ১·৯০ লক্ষ শিক্ষক সরকারী কর্মচারী। যারা স্কুলের শিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন তারা অনেকেই কৃষি কাজ সহ অন্যান্য পেশাগত কাজের সংগেও সম্পর্কিত। ফলে, বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি ছাড়াও স্কুল চলাকালীন অনেক সময়ে শিক্ষকতা বহির্ভূত অন্যান্য কাজকর্মে তারা ব্যস্ত থাকেন। শিক্ষকদের শিক্ষাদানের যে দায়িত্ব থাকে তা সম্পূর্ণ ভাবে পালন না করার কারণে স্বভাবতই শিক্ষার নির্দিষ্টমান অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা।

১২। শিক্ষার মানের সংগে সম্পর্কিত অপর একটি বিষয় হলো পাঠ্যক্রমের চরিত্র। পাঠ্যক্রম যদি বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ধারিত না হয় এবং সমাজের বাস্তব অবস্থার সংগে সম্পর্কিত বা সংগতিপূর্ণ না থাকে, তাহলে সে পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষা ছাত্রদের শিক্ষার মান কখনো উন্নত করতে পারে না। তা ছাড়া পাঠ্যক্রমে এতো বেশী সংখ্যক বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা রয়েছে যে, যে সব বিষয়ে ও যেভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেটা সময় ও বুদ্ধি দু'দিক থেকে তাদের ধারণক্ষমতারবাইরে।

১৩। দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৪৯ শতাংশ মেয়ে ও মহিলা। অথচ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাক্ষরতার হারের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে স্বাক্ষরতার হার গড়ে ৩১ শতাংশ এবং মেয়েদের শিক্ষার হার মাত্র ২২ শতাংশ। প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ভৌত ব্যবস্থা না থাকার ফলে বর্ধিত হারে মেয়েদের আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ ব্যহত হচ্ছে। বিগত দু'টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট

৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বাণী

শিক্ষাকে জীবনের নিত্য সংগী করতে না পারলে সমাজে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সাধন করা যায় না। মানুষের জীবনকে অর্থবহ করে বেঁচে থাকার জন্য পথ দেখায় শিক্ষা। সরকার তাই দৈনন্দিন জীবনের সংগে শিক্ষাকে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত করার ব্যাপক পরিকল্প না হাতে নিয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি নিরক্ষর মানুষের কাছে সাক্ষরতার আলো পৌঁছে দেয়ার জন্য সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। জগদ্দল পাথরের মত চেপে থাকা নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করার শপথের দিন হোক আজকের এই আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতার দিবসটি।

অধ্যক্ষ মোঃ ইউনুস খান
প্রতিমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

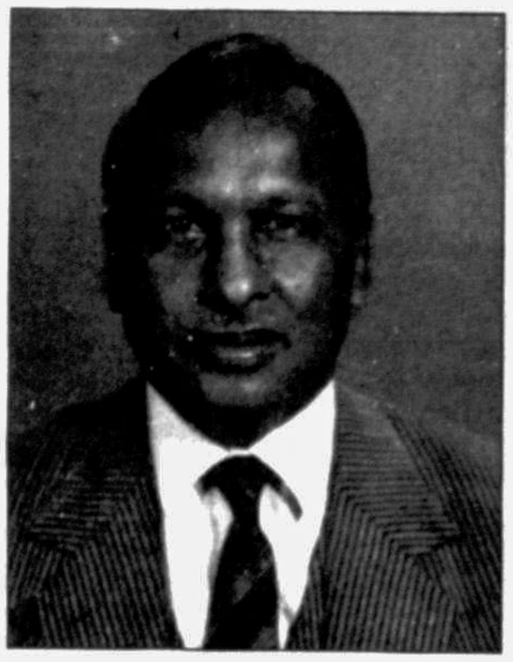

এদেশের সকল মানুষের ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার মধ্যেই আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবসের সার্থকতা নিহিত। মানুষের চেতনার দ্বার উন্মুক্ত করার বাহন হচ্ছে শিক্ষা। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দেশের সকল মানুষকে স্বাক্ষরতার আওতায় আনার জন্য সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারী পর্যায়েও ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণের উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের চেতনাকে সমুন্নত রাখার জন্য বর্তমান সরকার শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে দেশের সকল নাগরিকের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। ঐক্যবদ্ধভাবে নিরক্ষরতা মুক্ত সমাজ গঠনের অংগীকার গ্রহণের দিন শুরু হোক আজকের এই আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস থেকে।

জমির উদ্দিন সরকার
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আগামী ২০০০ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা মুক্ত একটি সমাজ গঠনের প্রত্যয় নিয়ে সরকার একটি ব্যাপক কর্মসূচীর মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় পৌছার সহায়ক শক্তি-শিক্ষা।

নিরক্ষরতা দেশ জাতি গঠনের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবসের তাৎপর্যই হচ্ছে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি এবং প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে শিক্ষার চেতনা সৃষ্টি। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর জন-গোষ্ঠীর কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা সমূহও বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। আশা করি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আমরা "সবার জন্য শিক্ষা" ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারবো।

শফিউল আলম
সচিব
শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার